স্মরণ : আজ ২৮ অক্টোবর
বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান এর মৃত্যুবার্ষিকী

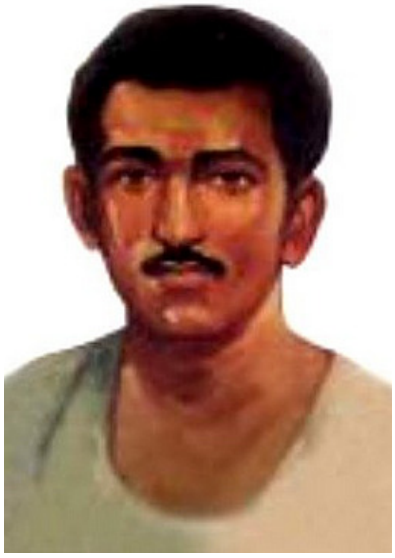

১৯৭১। ২৫ মার্চের রাতে মায়ের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে এসেছিলেন হামিদুর রহমান। ফেরার সময় মাকে বলেন, ঈদে খরচ পাঠাব। কোনো চিন্তা করো না। দুই মাসও হয়নি হামিদুর মিলিটারিতে ভর্তি হয়েছে। এরই মধ্যে রাতের বেলা বাড়ি এল কেন? আবার চুপিচুপি ভোর রাতে চলেই বা যাচ্ছে কেন? একটা পুরনো লুঙ্গি আর শার্ট পরে বাড়ি এসেছে, সে কিভাবে সংসারের অভাব ঘোচাবে, ভাইবোনদের কিভাবে দেবে নতুন জামাকাপড়? মায়ের মনে শত প্রশ্ন। মনের ভেতর ভয় আর উদ্বেগ নিয়ে দোয়া পড়ে মাথায় ফুঁ দিয়ে সেদিন বিদায় দিয়েছিলেন ছেলেকে।

সিপাহি হামিদুর রহমান দেশকে হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। শ্রীমঙ্গল থেকে ১০ মাইল দক্ষিণে ধলই সীমান্ত ঘাঁটি। এরই মধ্যে চা বাগানের মাঝে আস্তানা গেড়েছে পাকিস্তানি হানাদাররা। ২৮ অক্টোবরের ভোররাত। জেগে আছে মুক্তিবাহিনীর একটি ইউনিট। এই ইউনিটের ওপর দায়িত্ব পড়েছে পাকিস্তানি বাহিনীকে হটিয়ে ধলই সীমান্ত ঘাঁটি দখল নেওয়ার। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভোররাতে আক্রমণ করা হবে ঘাঁটিতে। এ দলেরই তরুণ যোদ্ধা হামিদুর রহমান। আক্রমণের জন্য তৈরি ইউনিটটি। সামনে দুই প্লাটুন সেনা এবং এক প্লাটুন পেছনে। অধিনায়কের আদেশে শেষবারের মতো শত্রু সেনার অবস্থান দেখে নেওয়ার জন্য চুপিসারে একটি গাছে উঠলেন হাবিলদার নজরুল। ঠিক তখনই গর্জে উঠল হানাদার বাহিনীর রাইফেল। অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কাইয়ুম বুঝে ফেললেন, শত্রুরা তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে। তাই আক্রমণ করতে হবে শত্রুর লক্ষ্য পরিবর্তন করে। ওয়্যারলেসে গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসারের সঙ্গে কথা বললেন অধিনায়ক। শত্রু বাহিনীর ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ করতে বললেন, তাহলেই হয়তো শত্রু“র লক্ষ্য বদলে যেতে পারে। এই সুযোগে পদাতিক বাহিনী আক্রমণ করবে।

বাঙালি গোলন্দাজ বাহিনীর কামান গর্জে উঠল। গোলাবর্ষণে ধলই ঘাঁটিতে আগুন ধরে গেল। আকস্মিক আক্রমণে হানাদারদের মনোবল ভেঙে গেল। এই সুযোগে ডান দিক, বাম দিক ও পেছন দিক থেকে আক্রমণ করল তিন প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধারা আরো অগ্রসর হলেন। কিন্তু একটি এলএমজির কারণে তাঁরা খুব একটা সুবিধা করতে পারছিলেন না। তা থেকে মুহুর্মুহু বেরিয়ে আসছে বুলেট। সামনে এগোতে হলে অবশ্যই এলএমজিটা থামিয়ে দিতে হবে। জীবন বাজি রেখে এগিয়ে গেলেন হামিদুর রহমান। উভয় পক্ষের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো অনবরত গর্জে উঠছে। যেকোনো সময় ফুটতে পারে মাইন। এসব উপেক্ষা করে হামিদুর পৌঁছে গেলেন এলএমজিটার কাছাকাছি। দুই এলএমজি চালকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের হত্যা করলেন। তিনিও শত্রু

পক্ষের গুলিতে শহীদ হলেন। মুক্তি-সেনারা ঢুকে গেলেন ধলই সীমান্ত ঘাঁটিতে। এলএমজি পোস্টের কাছে দৌড়ে এসে পেলেন শহীদ হামিদুর রহমানের মৃতদেহ। ধলই বর্ডার আউটপোস্ট দখল হলো সিপাহি হামিদুর রহমানের অসীম সাহসিকতার জন্যই। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবাসা গ্রামের একটি মসজিদের পাশে ওই সময় বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী হামিদুর রহমানকে দাফন করা হয়। ৩৬ বছর পর ২০০৭ সালের ১১ ডিসেম্বর তাঁর দেহাবশেষ ভারতের ত্রিপুরা থেকে ঢাকায় এনে শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

প্রিয় মাতৃভূমির জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের স্বীকৃতি হিসাবে জাতি এই শহীদকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে সম্মানিত করেছে। হামিদুর রহমান ১৯৪৫ সালে ভারতের ২৪ পরগনা জেলার চাপড়া থানার ডুমুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর হামিদুর রহমানের বাবা আক্কাস আলী মণ্ডল ও মা কায়ছুননেছা ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার খোর্দ্দ খালিশপুর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। এই মহান বীর-সেনার নামে তাঁর পৈত্রিক ভিটা খোর্দ খালিশপুর গ্রামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে হামিদনগর। সেখানে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের নামে একটি কলেজ ও স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঝিনাইদহ জেলা শহরে একমাত্র স্টেডিয়ামটি বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের নামে। তার নামে মৌলভীবাজারের ধলই ফাঁড়িতে একটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে। এই বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমানের মা-বাবা কেউ আজ আর বেঁচে নেই। তার মা একবার ছেলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, ছোটবেলা অসম্ভব পরিশ্রমী আর সাহসী ছিলেন তিনি। ভালো হা-ডু-ডু খেলতেন। সমাজসেবামূলক কাজেও ছিলেন বেশ উৎসাহী। গ্রামের কেউ মারা গেলে দাফনের কাজে তাকেই দেখা যেত সকলের আগে।

শাহনেওয়াজ খান সুমন, সাংবাদিক। ই-মেইল : sumonreporter@gmail.com
প্রয়োজনে : 01711-170248